Vol. 34 | No. 3 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা বৈশিষ্ট্য ও ধারা—সমীক্ষা

Volume	34
Issue	3
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী দীন মুহম্মদ
Published online	June 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i3.6
Pages	99-120
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা বৈশিষ্ট্য ও ধারা–সমীক্ষা

কাজী দীন মুহম্মদ

সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আধুনিক যুগের সঙ্গে মধ্যযুগের যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, গীতিকবিতার ধারায়ও অনেকখানি সেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিকতার মাপকাঠিতে এবং সমকালীন যুগ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগের গীতিকবিতার মূল্য নিরূপণ খুব সহজ নয়।

মধ্যযুগের সার্বিক পটভূমিকা আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, সমাজ একদিকে দেবতা ও ধর্ম নির্ভরশীল, অপরদিকে দ্বিতীয় দেবতা স্বরূপ সামন্তরাজ শাসকশ্রেণী সমস্ত দেশবাসীকে নির্যাতনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। সাধারণ জনসমাজ প্রজারূপে রাজন্যবর্গের আদেশবাহী ভৃত্য। দেবতা ও শাসকগোষ্ঠীর স্তব-স্তুতির দ্বারা তৎকালীন সাহিত্যকর্মের সূচনা। মানুষের জীবন সেখানে সমাজবদ্ধ, সে সমাজ বিভিন্ন ধর্মের আচারে সীমায়িত। এই সীমাকে কোনপ্রকারে লঙ্ঘন করলেই মানুষ যেমন সমাজচ্যুত হয়েছে, তেমনি কাব্যরচনার ক্ষেত্রেও সে গোষ্ঠীর মনোরঞ্জন অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। কবির আপন মনের গোপন কথাও বলার অবকাশ ছিল না— আর তা কেউ শুনতেও চায়নি। তাই এ যুগের অধিকাংশ কাব্যই কাহিনীধর্মী এবং তাতে কোন বিশেষ ধর্ম ও সমাজের খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন চিত্র প্রতিফলিত।

মধ্যযুগের বাংলাদেশে যে বিভিন্ন জাতির সমন্বয় সাধিত হয়েছিল, সমকালীন সাহিত্য তার সাক্ষ্য বহন করছে। বিদেশী শাসকদের স্বরূপ বুঝতে না পেরে দুর্বলচিত্ত হিন্দুগণ দেবতার শরণাপন্ন হল। মুসলিম সংস্কৃতিকে প্রতিহত এবং নিজেদের আত্মরক্ষার নিমিত্তে তাঁরা দেবতাকে কেন্দ্র করে এমন কাহিনীকাব্য

প্রণয়ন করলেন যেখানে স্বর্গবাসী দেবতা মর্তের মলিনতার স্পর্শাধীন। কৃষ্ণের আবির্ভাব অবতার রূপে; কিন্তু পরিণতি প্রেমের নায়ক হিসেবে। এর পার্শ্বে প্রায় সমান্তরালভাবে রচিত হয়ে চলেছে বিদেশাগত মুসলমান ঐতিহ্যপূর্ণ কাব্যধারা। দেবতা এখানে প্রাধান্য না পেলেও সামন্ততান্ত্রিক শাসক নায়ক প্রায় দেবতার মত কাজ করেছে। কখনও বা স্রষ্টার বাণী বহনকারী মহাপুরুষেরা কাব্যকাহিনীর নায়ক।

আধুনিক কবি বিভিন্ন রূপ রস ও মিলন-বিরহের কথা নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু মধ্যযুগে এইসব কাহিনীকাব্যধারায় গীতিকবিতার যে উপাদানটুকু নিহিত ছিল, তা একটি প্রেম ভালবাসার আভাস ও অনুভূতি মাত্র। এই অনুভূতি শুধু জীবাত্মা-পরমাত্মা বা স্রষ্টা-সৃষ্টির সম্পর্কের ভিতরেই বিধৃত নয়, মানুষের হৃদয়বোধ ও মানসিক চেতনাবোধের সঙ্গে তা পার্থিব বিচিত্র রসে অভিষিক্ত হয়েছে এবং এই সূত্র ধরে গীতিকবিতা আপন প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। আধুনিক গীতিকবিতা বলতে যা বুঝায়, তারই কিছু গুণসম্পন্ন মধ্যযুগীয় কাব্যশিল্পকে আমরা মধ্যযুগীয় গীতিকবিতা নামে আখ্যায়িত করে থাকি। আকৃতি এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে একমাত্র পদাবলী সাহিত্যই গীতিকবিতার সমগোত্রীয়। বিরাট কলেবরযুক্ত কাহিনীকাব্য রচনার মধ্যে এ-একটি ব্যতিক্রম। কাব্যসৃষ্টির মৌলিক প্রেরণা থেকেই আমরা গীতিকবিতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। আপন মনের বিচিত্র অনুভূতিপূর্ণ কল্পনার মুক্তি ঘটে গীতিকবিতায়। কিন্তু মধ্যযুগে এই প্রেরণা এসেছে ধর্মীয় চৈতন্য থেকে। সে যুগের সমাজে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পরিচয় ছিল কবি হিসেবে নয় —মহাজন হিসেবে এবং নামকীর্তনের জন্যই পদগুলি অধিক সমাদর লাভ করেছিল। ভক্ত মহাজনেরা গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে এই নাম কীর্তন করত, ফলে সমষ্টিগত মনের পরিচয় এতে প্রতিফলিত। সূফীতত্ত্ব ও বৈষ্ণবধর্মের যে দিকটা জনমনকে অধিক আকৃষ্ট করল তাতে পদকারগণ স্বীয় গুরুকেই আদর্শ করে পদ রচনা শুরু করলেন। হৃদয়ের সমস্ত ভাব, রস দিয়ে সেই আদর্শ মূর্তিকে সুন্দরভাবে প্রকাশের চেষ্টায় তারা ব্যাকুল; আপন অন্তরাত্মার পরিচয় প্রদান তার চাইতে অধিক মূল্যবান নয়। ধর্মীয় আবরণ এবং ব্যক্তিমনের অনুপস্থিতি সমস্ত পদসাহিত্যকে করেছে নিষ্প্রভ ও সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে দেশ-কাল ও ধর্মের গণ্ডীকে অতিক্রম করে আধুনিক গীতিকবিতার উজ্জ্বল বিকাশ। সর্বপ্রকার বাধা-বন্ধনকে ছিন্ন করে ব্যক্তিমনের মুক্তিই অধুনা কাব্যজগতের জয় ঘোষণা করছে।

ভাষা ও বিষয় নির্বিশেষে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে খোল করতাল সহযোগে তা সুর করে লোকমুখে গীত হত। বিভিন্ন কাব্যে

কাহিনীকে অন্ত্যমিলযুক্ত ছন্দে আবদ্ধ করে এবং বিচিত্র সুরের প্রলেপ দিয়ে একে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলা হত। অবশ্য এর পেছনে কারণও ছিল। আধুনিক কালের ন্যায় মুদ্রণের মাধ্যমে গ্রন্থ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই তখন ছিল না। বিভিন্ন আসর এবং রাজদরবারে মাঝে মাঝে এর চর্চা চলত। এমনি করে বর্তমান সাহিত্য জগতে ঐ সমস্ত কাব্যধারা স্থায়ী রূপ লাভ করেছে।

মধ্যযুগের অধিকাংশ রচনাই দীর্ঘ পরিসরযুক্ত কাহিনীকাব্য —একথা আগেই বলা হয়েছে। পদাবলী সাহিত্য খণ্ডাকারে রচিত হলেও এর ভিতর দিয়ে কাহিনীর একটি ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যধারার মধ্যে যে সৌন্দর্যটুকু প্রকাশ পেয়েছে এর কোরাসধর্মিতা সে-গুণকে অনেকটা ক্ষুণ্ন করেছে। রাধা-কৃষ্ণকে নায়ক-নায়িকা স্বরূপ গ্রহণ করে একাধিক কবি কাব্য প্রণয়ন করেছেন, ফলে বিষয়টি হয়েছে বৈচিত্র্যহীন; কবির পৌরুষচেতনার কোন আভাস এতে সামান্যই পাওয়া যায়। এই অনন্ত জগতে কাব্যরচনার ক্ষেত্রে আর কোন উপাদানের সন্ধান যেন তাঁরা পান নি। অহংকে প্রকাশের যে অদম্য স্পৃহা আধুনিক যুগে দৃষ্ট হয় মধ্যযুগে আমরা তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। নিজেকে প্রকাশ করার চাইতে আত্মগোপনের চেষ্টাই অধিক ছিল বলা চলে। কারণ অনেক কবিই সমাজে প্রতিষ্ঠিত কবির নামে নিজের রচনা প্রকাশ করে পরম সন্তুষ্টি লাভ করেছেন; যার ফলে কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির সমস্যায় মাঝে মাঝে পণ্ডিত সমাজ বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন। মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থায় শাসক এবং পীরের পর সকল মানুষই সমান ছিল। মানুষ হিসেবে সে সমাজ বা গোষ্ঠির একটি জীবন মাত্র; কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে কোন পৃথক সত্তার অধিকারী নয়। তাই এ-যুগের কবিতায় ব্যক্তিমনের ধ্যান-ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক যেমন বিপরীতার্থক শব্দ, তেমনি এর ভেতরে গভীর ঐক্যও রয়েছে। যে কবিতার **Personal** হবার যোগ্যতা নেই, তার পক্ষে **Impersonal** ভাব বহন করা দুষ্কর। আপন অন্তরাত্মাকে দেখবার যার ক্ষমতা নেই, বিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক সে স্থাপন করবে কি করে।

আধুনিক বাংলা কবিতা ইংরেজী **Lyric poem**-এর সমধর্মী সন্দেহ নেই; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ভাষা-সভ্যতা বিনিময়ের পূর্ব-ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায় যে, তৎকালে এই দুই দেশের সাহিত্যকর্মে অনেকখানি সাদৃশ্য বর্তমান। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইংরেজী প্রভাব কোন মতেই সম্ভব ছিল না। কারণ পরোক্ষভাবে এদেশে সপ্তদশ শতকে ইংরেজ আগমন ঘটলেও উনিশ শতকের পূর্বে তারা সাহিত্য জগতে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু মধ্যযুগীয় গীতি কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে।

ইংরেজী গীতিকবিতার মৌলিক রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে হাডসন সাহেব বলেছেন, It, in the original meaning of term was poetry composed to be sung with the accompainment of a lyre or harp"[১]

মধ্যযুগের কবিতার এ একটি বড় বৈশিষ্ট। পাশ্চাত্য দেশেও mediaeval age-এ গীতিকবিতার এ সীমাবদ্ধ রূপ পরিলক্ষিত হয়। গ্রীক সংস্কৃতির অনুকরণে সাহিত্যে দেব-দেবীর প্রভাব পড়েছে এবং *lyrical ballad* গুলোতে knights দের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ইংরাজী, বাংলা নির্বিশেষে মধ্যযুগীয় কবিতা গীত হত এবং সুরের তানে ছন্দ ও অর্থের ক্ষতিপূরণ করা হত। বর্তমানের কাব্যধারায় এই রীতির অনুশীলন দুর্লক্ষ্য। গীতিকবিতার গীত হওয়ার উদ্দেশ্য এখন গৌণ, পাঠই এখন এর প্রধান উদ্দেশ্য। কবিতার প্রথম এবং প্রধান রস উপলব্ধ হবে পাঠের মাধ্যমে এবং তা পরিবেশিত হবে চিত্র ও শব্দনৈপুণ্যের মাধ্যমে। তাই ভাব ও ছন্দের গতির মধ্যেই কবিতার পূর্ণরূপ প্রকটিত। সুরের জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকলে কবিতার অঙ্গহানিরই পরিচায়ক।

ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত না হলেও মধ্যযুগীয় গীতিকবিতা বিদেশী প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত নয়। এ দেশে মুসলমান আগমনের পর থেকেই বিভিন্ন শাসনকর্তা ও পীর দরবেশদের ও ওলি-আওলিয়ার মারফতে ইরান, আরব প্রভৃতি দেশের ভাবধারা ও সাহিত্য-শিল্পের আমদানী হয়। শেখ সাদি, হাফিজ, রুমী প্রমুখ কবি রচিত গজল ও কবিতায় পদাবলী সাহিত্যের একাত্মতা খুঁজে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের আখ্যান মূলক ও আধ্যাত্মিক কাব্যরচনার ভেতর দিয়ে কবির ব্যক্তিমনের আবেগময় প্রকাশ বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণপ্রভা বিস্তার করেছে। পদাবলী সাহিত্যে আমরা শিল্পরসের যে পরিচয় পাই, পাঠক হৃদয়ে তা যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম। সাধারণ্যে কীর্তন হিসাবে পরিচিত হলেও কোন কোন পদ দেশ, কাল ও ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করে শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়েছে। তাই এত প্রকার বন্ধন জালে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মধ্যযুগের মানুষের, আপন হৃদয়ের আকুতি একেবারে বিনষ্ট হয়নি। কাব্য জগতে পদাবলী সাহিত্যের এই উৎকর্ষ মাত্র এক যুগের শিল্প-প্রয়াসের ফল নয়। উৎস সন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে, সুদূর অতীতে মূল বিস্তার করে তা রস সংগ্রহ করেছে। বিভিন্ন কাব্য দ্বারা তিলে তিলে আহৃত এই রসের পূর্ণ ও সার্থক বিকাশ ঘটেছে মধ্যযুগীয় গীতিকবিতা তথা পদাবলী সাহিত্যে।

গীতিসুর বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন যুগ হতে গোচরে অগোচরে তারা যে কাব্যশিল্প সৃষ্টি করেছে তাতে গীতিময়তা বিজড়িত। আধুনিক-পূর্ব যুগ পর্যন্ত মানবজীবনে যা কিছু ঘটেছে তাতে ধর্মীয় অনুশাসন প্রযুক্ত; যা সৃষ্টি হয়েছে তাকেই দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন

হিসেবে অধুনা যাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেই চর্যাপদসমূহ তৎকালে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনতন্ত্র ও আচার—পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হত। নির্বাণলাভের পথ নির্দেশ করতেগিয়ে পদগুলোতে আধ্যাত্মিক জীবন ও জগৎসম্পর্কীয় নানাপ্রকার নীতি–উপদেশ প্রচারিত হয়েছে। পার্থিব মোহ হতে মুক্তিসাধনার মন্ত্র ছাড়া এর যে অন্য মূল্য থাকতে পারে সংসারবিরাগী সিদ্ধাচার্যদের নিকট তা ছিল অজ্ঞাত। তাই বিশেষ শ্রেণীর ধর্মীয় গাঁথা হিসেবেই বৌদ্ধগান দোঁহাগুলি এ যাবৎ রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু অন্ত্যমিলযুক্ত পয়ার ছন্দে রচিত এ–খণ্ড শিল্পসৃষ্টিকে আমরা একাধারে কবিতা এবং সঙ্গীত নামে অভিহিত করতে পারি। পদগুলির প্রথমে পটমঞ্জুরী, গুঞ্জরী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধনসী, রামশ্রী, বরাড়ী, মল্লারী, মালশী, বঙ্গাল, শর্বরী, কহ্নু–গুংজরী প্রভৃতি রাগের উল্লেখ আছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, পদগুলো গীত হত। যে গুণে রচনা কাব্য হয়ে উঠে সে রসময়তা বৌদ্ধগানগুলোর স্থানে স্থানে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সাধনতন্ত্র হিসেবে এর অন্তর্নিহিত যে অর্থই থাকুক না কেন রসিকজন মাত্রেই এগুলো পাঠ করে কিঞ্চিত রসের সন্ধান পাবেন।

জেইসি তুঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমল রস পিবমি।।

আলোচ্য পদে আদি রসের আবরণে কাব্যগুণসম্পন্ন গীতরস প্রধান হয়ে উঠেছে। সিদ্ধাচার্যের সাধনসঙ্গিনী যোগিনী হোক আর প্রেমিকাই হোক তাকে না দেখলে মুহূর্তের তরে জীবনধারণ করাও যেন অসম্ভব। তাই সর্বক্ষণ ডোমনীর মুখ–কমল–রস পান করবার নিমিত্ত সিদ্ধা কবি তৎপর। রোমান্টিক ও মিস্টিক ভাবসমৃদ্ধ ক্ষুদ্র পরিসর যুক্ত এ–পদগুলো রূপক–উপমা পরিবেশনে এর কাব্যধারাকে আরও ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে।

কমল বিকশিল কহিহ ন জমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোকেন ভোমরা।।

মধুপূর্ণ যে পদ্ম তার সন্ধান তৃষ্ণার্ত ভ্রমরকে জানাতে হয়না; সে নিজে খুঁজে নিতে পারে এবং একবার রসমধু পান করলে আর ফিরতে চায় না। প্রকারান্তরে কবি নিজের মোহমুগ্ধ অবস্থার কথাই ব্যক্ত করেছেন। যোগী কবিগণ শুধু মুদ্রিত নয়নে ধ্যান করেছেন বলে মনে হয় না। উচ্চ পর্বতোপরে ময়ুরপুচ্ছ, গুঞ্জার মালা প্রভৃতি পরিহিতা শবরী বালিকার রূপ বৌদ্ধকবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ডোমনীর নৃত্যকৌশলে মুগ্ধ হয়ে তাকে মনের পেটিকা উপহার দিতে চেয়েছে। এভাবে দেখা যায় যোগিনী বা ডোমনী কেবল কবির সাধনসঙ্গিনীই নয়, কবির হৃদয়পটে স্থান লাভ করে প্রেমের বীজও বপন করেছে। পরিমিত পরিসর ও শব্দালংকার প্রয়োগের এমন একটি কৌশল আছে যে পদগুলো পাঠ করতে গেলে একটা সুরের অনুরণন মনের কানে দোলা দেয়।

মধ্যযুগের গীতিকবিতায় প্রধান উপাদান প্রেমের ধারা। প্রেম পদাবলী সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ। প্রাচীন বাংলা অপেক্ষা জয়দেবের সংস্কৃতধর্মী কাব্যগ্রন্থ গীতগোবিন্দের সঙ্গে তার অধিক সাদৃশ্য রয়েছে। তাই পুরোপুরি বাংলা না হলেও গীতিকবিতার স্বরূপ নির্ণয়ে *গীতগোবিন্দ*-এর ভাব-বৈচিত্র্য আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্বের অন্তরালে এতে গীতিমনের প্রকাশ ঘটেছে। ''গীত গোবিন্দ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি, আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনা অপেক্ষাকৃত গৌণ। দার্শনিক তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত অশরীরী, অলৌকিক প্রেমের মধ্যে তিনি প্রকৃত প্রেমের তীব্র হৃদয়াবেগ ও রসানুভূতি সঞ্চার করে একে কাব্যগুণ সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।''[২]

গীতগোবিন্দের ভাষা সংস্কৃত হলেও এ এক অভিনব সৃষ্টি। কাব্যকে অধিকতর গীতিমুখর করবার জন্য কবি সংস্কৃতের চিরাচরিত প্রথাকে ত্যাগ করে অন্ত্যমিল ছন্দ ব্যবহার করেন। জয়দেব একজন রসিক সঙ্গীতভক্ত ছিলেন বলে কথিত আছে। তিনি সমস্ত কাহিনীটিকে খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করেছেন এবং প্রথমে একে পদাবলী নামে অভিহিত করেন। যথা 'মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং।' *গীতগোবিন্দের* শ্লোকের মধ্যে বীণার ঝঙ্কারের মত, নূপুরের নিক্কনের মত, একটা মধুর সুর আপনা থেকে বেজে উঠেছে এবং সে সুরের বৈশিষ্ট্য হলো, তা প্রাণের সুরের সঙ্গে গাঁথা।

তুর্কী আগমনের পরেবড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এবং অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে যে শিল্পচর্চার বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, তাতেও পূর্ববর্তী আবেগপ্রবণ গীতিসুরের ক্রমভঙ্গ হয়নি, বরং পূর্বধারার পরিণতি ও পরিপুষ্টি স্পষ্টতর হতে দেখি। তা মধ্যযুগের প্রাচীনতম রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ঐতিহ্য বহন করে এসেছে! এমন কি জয়দেব রচিত কতকগুলি পদের যথাযথ অনুবাদও এতে স্থান পেয়েছে।

মধ্যযুগের কাব্যাকাশে ধর্মের মেঘাচ্ছন্নতা পরিদৃশ্যমান। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য তাই পৌরাণিক দেবধর্মের মহিমায় উন্নীত। কৃষ্ণ এখানে শঙ্খ চক্র-গদাধারী অবতার। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এবং *পদাবলী* সাহিত্যে উভয়ই রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে রচিত; কিন্তু কাব্যের সামগ্রিক বিচারে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* গ্রন্থখানি একটি সঙ্কর সৃষ্টি। এতে গীতিকাব্যের রোমান্স আছে, তবে স্থূল রোমান্স এবং 'কাহিনী কাব্যাকারে' কাহিনীটি পরিবেশিত হয়েছে। কোথাও কোথাও তা অশ্লীলতা ও গ্রাম্য দোষে দুষ্ট। তথাপি মানবিক প্রেমের অবদান এতে দুর্লক্ষ্য নয়। আখ্যানমূলক এ-কাব্যটির পদ পরিবেশন ও রাগ-রাগিনী নিরূপণে কবি জয়দেবের প্রভাব বিদ্যমান। হৃদয়োচ্ছ্বাসপূর্ণ করুণ রসের মূর্ছনায় এর কতকগুলো অংশ

গীতিকবিতার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর গীতিপ্রবণতা সম্বন্ধে বলেছেন, 'কাব্যের শেষাংশে কবি কৃষ্ণকে ঔদাসিন্যে অবিচলিত রেখে রাধার প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে বিরহ বেদনা ও আকুল আত্মনিবেদনের দ্বারা মার্জিত ও বিশুদ্ধ করে আবার সনাতন ভাব মাধুর্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন।' ৩

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধাবিরহখণ্ড, সমগ্র গ্রন্থখানির সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে কাব্যগুণের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে। গীতিকবিতার সর্বপ্রকার মহৎ ও মৌলিক উপাদান এতে বিদ্যমান। খণ্ডাকারে এক একটি ভাব পরিবেশিত হয়েছে। আর সে ভাব পূর্ণতার জন্য সুরের অপেক্ষা রাখে না; অর্থের গভীরতায় পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে। বিরহ প্রকাশে কবির ব্যক্তি হৃদয়ের বেদনার যে পরিচয় মিলে তা বিশ্বজনীনতার দাবী করতে পারে। কেবল কবির নিজ অন্তরের নয়, অনন্তকালের চিরবিরহী মনের এ–ইতো প্রকৃত রূপ:

পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ি পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণী।।
(বংশীখণ্ড)

পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কথা নিয়ে যা রচিত হয়েছে তা বিশেষ কোন গ্রন্থ নয়, বিভিন্ন মহাজন কর্তৃক রচিত পদসমূহ একত্রিত হয়ে পদাবলী সাহিত্যাকারে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে। সূফী বৈষ্ণবরা গণ–মানসে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সাহিত্যের প্রতিটি স্তরে তার ছাপ সুস্পষ্ট। আধুনিক গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠত্ব যে অর্থে প্রতিপন্ন হয় সেই আপন সুরে আপন মনে গাওয়ার সূচনা মধ্যযুগেই পাওয়া যায়। কাব্যজগতের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে আধুনিক যুগ মধ্যযুগ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং এর ক্রমপরিণত নব্যরূপ। আপন বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক বিচারে পদাবলী সাহিত্য সমকালীন সমস্ত সাহিত্যকর্ম থেকে পৃথক। প্রায় দীর্ঘ তিন শত বৎসর ধরে বিচিত্র রাগিনীতে এর সুর অনুরণিত হয়ে কেবল কবিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে নি, এর যথেষ্ট পুষ্টি সাধনও করেছে।

বৈষ্ণব পদাবলী প্রেমের কাব্য। ধর্মের আবরণ সত্ত্বেও এতে মানবিক আবেদন উপস্থিত। যে কারণে মধ্যযুগে লৌকিক সাহিত্যের উদ্ভব, সে প্রবণতাই পদাবলীতে বিধৃত রাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্যকে অনেকটা পৌরাণিকতাশূন্য করেছে। প্রেম মনুষ্য হৃদয়ের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আর স্বাভাবিক বলেই তা চিরন্তন। প্রবল স্রোতধারার ন্যায় প্রতিকূল বাধা এর গতিকে ক্ষিপ্র করে তোলে; প্রেমের পরকীয়া রূপটি এ গতিকে করেছে আরো তীক্ষ্ণ তীব্রতর।

কোনপ্রকার সামাজিক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক নয়, শুধুমাত্র আন্তরিক ভালবাসার আকর্ষণে এই কাব্যের পুষ্টি। সমালোচকের মতে রাধা-কৃষ্ণ নাম উল্লেখ করায় এর নৈর্ব্যক্তিকতা ক্ষুন্ন হয়েছে। কিন্তু মানব-মানবীর প্রেমের অভিব্যক্তিতে কারো নাম যদিই বা থাকে তাতে শিল্পরস ক্ষুণ্ন হওয়ার কথা নয়। বরং বিশেষকে অবলম্বন করে নির্বিশেষের ব্যঞ্জনার এতে যেমন সুবিধা, তেমনি ব্যক্তিকে আশ্রয় করে নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের অভিব্যক্তি রূপময় করে তুলতে অতুলনীয়। এ-রাধা সব কালের, সব ঘরের রাধা, দেবী নয়; এ-কৃষ্ণ সব ঘরের সব কালের নাগর, দেবতা নয়। তাই এ-কাব্য সার্বজনীন প্রেমের কাব্য হবার দাবী রাখে। কারণ প্রেমের কবিতায় প্রেমিক প্রেমিকার মনের স্পর্শ সর্বত্রই কমবেশী অনুভূত হয়। পদাবলীর রাধা কৃষ্ণও কোন পৌরাণিক দেবতা নয়, তারা নায়ক-নায়িকার প্রতীক— তাই এ যুগে 'কানু ছাড়া গীত নেই।'

আমরা প্রথমেই দেখেছি যে, গতানুগতিক কাহিনীকাব্য থেকে পদাবলী সাহিত্য একটু ভিন্ন ধরনের রচনা। খণ্ড খণ্ড কবিতার মধ্য দিয়ে এর পরিণতরূপ প্রকাশমান। প্রেমের দুর্বার গতিতে এমন ভাবে নায়ক-নায়িকা ছুটে চলেছে যে সমাজ-সংসারের কোন বন্ধন তাদের পথ একেবারে রুদ্ধ করতে পারেনি। তৎকালীন সমাজের অসম-বৈবাহিক বন্ধন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্ধনই হয়ে থাকত, মিলনের সুযোগ দিত না। রাধা আইহনের পরিণীতা স্ত্রী; সংসারের বিভিন্ন বন্ধনে সে স্বামীর নিকট স্বকীয়; কিন্তু কৃষ্ণ দূরের মানুষ তাই তার প্রতি আকর্ষণ গভীর।

আধুনিক কালেও গীতিকবিতার বিষয় নির্বাচনে দেখা যায় যে, প্রেম এর অন্যতম অঙ্গ। *পদাবলী* সাহিত্যে রাধা প্রেমের মূর্তিমতি প্রতীক। কাব্যজগতে তার আবির্ভাব কিশোরী রূপে, যে বয়সে নারীমনে প্রথম প্রেমের রোমান্স অনুভূত হয় এবং চপলতার বিচিত্র ভঙ্গীতে এই প্রেমের প্রথম প্রকাশ ঘটে। রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু এর কাব্যরসকে ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। প্রেমের সার্থকতা বিরহে। সে ক্ষেত্রেও দেখা যায় পদাবলীর সমাপ্তি *মাথুর* কবিতায়। এদিক দিয়ে পদাবলী সার্থক প্রেমের কাব্য। এই সার্থকতা অর্জন করতে গিয়ে পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান প্রভৃতি প্রেমের বিচিত্র রসের আস্বাদন একে গীতিমুখর করে তুলেছে। বিষয়, ভাষা ও রচনার মণ্ডনকলাগুণে এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। প্রেমের ব্যাখ্যানে তা সমাজ-ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করে সাধারণ মানবমনে রস সঞ্চার করতে পেরেছে।

'বৈষ্ণব কবিদিগের আধ্যাত্ম ভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহাদের আর একটি দিক আছে, তাহা কবিত্বের দিক।[৪] সমালোচকের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য। লক্ষ্য তার যে মহাসত্যই হোক, সে যে পার্থিব সৌন্দর্যের বিজয়-রথে আরোহণ

করে যাত্রা শুরু করেছে — মাটির মানুষের কাছে তার মূল্যই অধিক। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার কাব্যরস আস্বাদন করতে গিয়ে কৃষ্ণের বাল্যজীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে গীতিসুর প্রতিধ্বনিত হয়। মাতৃহৃদয়ের স্নেহসিক্ত কথাগুলো পাঠকমাত্রেরই প্রাণ-স্পর্শ করে এবং সুরের প্রলেপে তা শ্রবনেন্দ্রিয়ে অমৃত বর্ষণ করেঃ

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরানের পরান নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেনু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি।।

মায়ের মনের যে আকুতি এখানে প্রকাশিত তা শুধু যশোদার নিজস্ব নয়, শিশুর জন্য এই ব্যাকুলতা চিরন্তন। ভাষা ও পরিবেশের ক্ষেত্রেও একটা রোমান্টিকতার স্পর্শ স্পষ্ট। পল্লীবাংলার শ্যামল প্রান্তরে বাঁশি বাজিয়ে গোচারণ করে ফিরছে রাখাল কৃষ্ণ আর মা যশোদা ঘরে বসে সেই বাঁশির প্রাণ মাতানো সুর শুনে পুত্রের নিরাপত্তা কামনা করছেন। সরল মধুর ও প্রাঞ্জল ভাষায় এই কবিতার অভিব্যক্তি। যেখানেই প্রেম সেখানেই সৌন্দর্য। প্রেমিক মাত্রেই সুন্দর ও যৌবনের পূজারী। আপাতদৃষ্টিতে যা অসুন্দর প্রেমিক কবি তার মধ্যেই সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন। যৌবনোদ্যমে নারীহৃদয়ে যে চঞ্চলতা দেখা দেয়, পদকর্তা তা বুঝেছেনঃ

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন গেল।।

প্রথম দৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকার প্রেমসঞ্চার মধ্যযুগীয় বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু বহু আধুনিক প্রেমিক-পেমিকাও এ ভুল করে থাকেন। ভালবাসা না হলেও ভাললাগার সূত্রপাত প্রথম দেখার শুভক্ষণেই হয় এবং এই সূত্রধরে প্রেম ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে। চলার পথে এ এক নতুন রসের আভাস দেয়। পদাবলী সাহিত্যের লীলাবৈচিত্র্যই শুধু রসসমৃদ্ধ নয়, এর পরিবেশ প্রকৃতিতেও রেমান্টিকতার ছোঁয়াচ লক্ষ্যণীয়।

সখি পরিবেষ্টিত হয়ে নায়িকা রাধা যমুনার ঘাটে জল আনতে গিয়েই নাগর কৃষ্ণের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করেছে। কৃষ্ণের বাঁশরী আগে থেকেই তাকে উন্মনা করেছিল এবার তার প্রেমের বীজকে অঙ্কুরিত করে তুলল। গীতিসুরের অপূর্ব অনুরাগ ধ্বনিত হয়েছে কয়েকটি কথায়। 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম/কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।' — প্রিয়ের নাম শুনে এই যে মন আকুল করার ভাব এই-ই-তো সার্থক গীতিকবিতার লক্ষণ। প্রিয় দর্শনের প্রথম স্তরে

যার হৃদয় চঞ্চল ছিল, ছলনা করে সে কৃষ্ণকে বার বার দেখবার চেষ্টা করেছেঃ

তহিঁ পুন মোতি হার তোরি ফেকল
কহত হার টুটি গেল।
সবজন এক এক চলি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি লেল।।

হৃদয়ে প্রেম জাগরিত হওয়া মাত্র সে রাধা উদাস হয়ে পড়েছে। আহার-বিহার বা বসন ভূষণে কোন আকর্ষণ নেই, এর কারণ সে বুঝেও বুঝতে পারে না। প্রেম অঙ্কুরিত হওয়ার প্রধান উপাদান সৌন্দর্য ও যৌবন উভয়েরই ছিল। তাই বাঁশির সুর আর দৈহিক রূপ মিলে তাদের মনে একটি গভীর সংযোগ সাধন করল। কৃষ্ণের বাঁশির শব্দে ঘরে বাস করা কঠিন, আবার পরিজনপরিবৃত ঘর ছেড়ে আসাও সহজ নয়, তাই রাধা বলছে,

বাঁশী বাজান জান না
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরান মানে না।

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনেচ্ছা চিরন্তন—রাধা হৃদয়ের এই আকাঙক্ষা তাই পাঠক মনকেও রোমাঞ্চিত করে তোলে।

হিয়ার পরশ লাগি হি মোর কান্দে।
পরান পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।

প্রিয় মিলনের জন্য রাধার যে অভিসার, সেখানে প্রেমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রেমিককে শুধু দূর থেকে দেখে তৃষ্ণা মিটে না, আবার অসংকোচে সর্বসমক্ষে তার সাথে মিলিত হওয়াও দুষ্কর। প্রিয়মিলনের এই বাধাই প্রেমিকাকে অভিসারের কুঞ্জ কুটির অনুসন্ধানে ব্যস্ত করে তোলে। সঙ্কেতকুঞ্জের পরিবেশই বা কত মনোরম। যমুনা নদী বয়ে চলেছে। এরই কুলে বিভিন্ন লতা গুল্ম পরিবেষ্টিত কদম্ব বৃক্ষের মূলে তাদের অভিসারস্থল। এমন নির্জন প্রান্তে সঙ্কেতকুঞ্জ তথাপি দিবাভিসারের উপায় নেই—কি জানি কে কোথায় দেখে ফেলবে আর তার প্রেমের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে! তাই অন্ধকার রাত্রিতে ঝড় ঝঝ্ঞা উপেক্ষা করে সে একাকী যাত্রা করেছেঃ

একে কুল কামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর
হাম যাওব কোন পুর।।

প্রেমিকার এসব বাধা কোন বাধা বলেই মনে হয় না; কারণ তার হৃদয়ে তখন এমন ইচ্ছা জাগ্রত হয়— প্রিয় মিলনেই যার একমাত্র পরিতৃপ্তি।

কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছুপর
তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম হেন দেহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজর কি আগি।

ভালবাসার মদিরা প্রেমিক কৃষ্ণও প্রাণভরে পান করেছেন। গভীর দুর্যোগের রাত্রি সে নীরবে শিরোধার্য করে প্রিয়ার আঙ্গিনায় এসে উপস্থিত হয়েছে। তা দেখে 'হৃদয় তাপের ভাপে ভরা' রাধার পরান ফেটে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে,

বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেহাই ঘরে।।

যদিও প্রেমিক–প্রেমিকার স্থান হৃদয়ে, বুক চিরে বের না করলে সে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না; তথাপি তার সঙ্গ একান্ত কাম্য। রাধাকে ছেড়ে কৃষ্ণও যখন মথুরায় যাত্রা করেছে তখনই রাধার বিরহজ্বালা উপস্থিত। বিরহজনিত হৃদয়ের যে শূন্যতা তার সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে নিম্নোক্ত কবিতাটিতেঃ

এ সখি হামাক দুঃখক নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।

প্রাকৃতিক পরিবেশও মনকে উতালা করে তুলেছে,

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মওদাদুরী ডাকে ডাহকী
ফাটিয়া যাওত ছাতিয়া।।

কৃষ্ণের অনুপস্থিতে পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করে রাধা আরও দুঃখ পেয়েছে,

চির চন্দন হার উরে না দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা।।
পিয়াক গরবে হাম কানুক না গনলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কিনা কহলা।।

বিরহে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন প্রিয়ার সাক্ষাৎ মিলেছে তখন রাধার সে কি আনন্দ! যেসব প্রাকৃতিক পরিবেশ তার বিরহী মনের আগুন দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত করত তাকে সে এখন আর ভয় করে না।

সোই কোকিল অব লাখ লাখ কেউ
লোখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বান হোউ
মলয় পবন বহুক মন্দা।।

পৃথিবীতে মানুষের চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই; সীমাহীন সে চাওয়া, রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের যে সুর,

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

এই মানসিকতা মধ্যযুগের কবির মনেও ছিল। প্রিয়াকে না পেয়ে প্রেমিক কত আক্ষেপ করেছে; মিলনের মুহূর্তে আনন্দাতিশয্যে সব ভুলে গিয়েছে; কিন্তু আবার সেই অতৃপ্তি জেগে উঠেছে।

কত মধু যামিনী রভসে গোঙাইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল।।

পদাবলী সাহিত্যে প্রেমের এই বিচিত্র ধারা প্রবহমান এবং চিরন্তন প্রেমিক মনে তা আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু রাগ-অনুরাগে, কি বিরহ মিলনে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে আধুনিক প্রেমিক-প্রেমিকার মনে যে অনুভূতি জাগরিত হয় পদাবলীর মধ্যে তার প্রকাশ সম্ভব, না হলে বিশ্ব কবির মনে কেন প্রশ্ন উঠেছে,

হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?
....
এত প্রেম কথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার সুখ, কার
আখি হতে! আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে! তারি নারী হৃদয়ে সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন।

শুধু ভাবনা নয়, ভাষা, ছন্দ, উপমা, অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও পদাবলী সাহিত্য আপন মহিমায় উজ্জ্বল। এতে মৈথল ভাষার প্রভাব স্পষ্ট যা হতে কৃত্রিম ভাষা ব্রজবুলির সৃষ্টি। মৈথিলী, ব্রজবুলি, বাংলা প্রভৃতি যে সকল ভাষায় মধ্যযুগীয় গীতিকবিতা রচিত হয়েছে, তাতে পয়ার ছাড়াও কয়েকটি ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনমাত্রা, চারিমাত্রা, পাঁচমাত্রা ও সাতমাত্রার লক্ষণাক্রান্ত এই কবিতাগুলো, তাই প্রধানতঃ এর ছন্দকে বলা হয় মাত্রাবৃত্ত। আমরা দেখেছি বাংলার প্রাচীন সাহিত্য *চর্যাপদ* থেকে ছন্দের সূত্রপাত। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এর ভিতর দিয়ে পদাবলীতে এসেও অনেকটা উন্নত রূপ লাভ করেছে। ত্রিপদী ছন্দেরও যথেষ্ট প্রয়োগ পদাবলীতে দেখা যায়ঃ

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরান ফাটে।।

সাত ও চার মাত্রা বিশিষ্ট ছন্দের ব্যবহারও কম নয়ঃ

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২
এ স খি হামারি দুখের নাহিক ওর
১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ১
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
২ ১ ১ ২ ১ ২
শূন মন্দির মোর ।। (সাত মাত্রা)
১ ১ ১ ১ ১১১১ ২ ১ ১
তহি অতি দূরতর বাদর দোল
বারি কি বারই নীলনিচোল। (চার মাত্রা)

আধুনিক গীতিকবিতায় এইসব ছন্দ অবাধে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দচয়ন আধুনিক কবিতার ভাবপ্রকাশের সহায়ক। শ্রুতিমধুর শব্দ কবিতার রস বৃদ্ধি করে থাকে। শব্দমাধুর্য ও সরলতার প্রকাশনায় *পদাবলী সাহিত্য* আধুনিক কবিমনেও কম প্রভাব বিস্তার করেনি। *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* এরই প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। মধ্যযুগীয় কবিতায় রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং প্রতি বছরের আগমনে প্রেমিক মনে নব প্রেরণা দান করে। যে দু'টো সময় মানুষের মন আনন্দিত ও উদাস হয় তাকে নিয়েই পদকর্তাদের কারবার। বসন্তের আগমনে কুঞ্জকানন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, নির্মল রাত্রিতে চাঁদের কিরণে সমস্ত প্রকৃতি মনোরম দৃশ্য ধারণ করে এবং বৃক্ষশাখে আপনমনে কোকিল কুহতানে দিক মাতিয়ে তোলে। আবার ঘনঘোর বর্ষার দিনে মেঘে ঢাকা আকাশ কেমন ম্লান হয়ে পড়ে। ময়ূরের নাচ এবং দাদুরীর ডাক উদাস হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

সকল বস্তুর সাথে উপমা প্রয়োগ আধুনিক কবিতার লক্ষণ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পদাবলী সাহিত্যেও আমরা এ-ধরনের পদের ব্যবহার দেখি। যেমন,

যাঁহা যাঁহা নিকষয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি।।

বিদ্যুতের সাথে রাধিকার অঙ্গচ্ছটার বর্ণনা করা হয়েছেঃ

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মুরুছা পায়।

আলোচ্য কবিতায় কৃষ্ণের রূপের সজীবতা রাধাকে আকৃষ্ট করেছে। চঞ্চল স্রোত যেমনি সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি কৃষ্ণের হাসিতেও রাধার মন উদ্বেল হয়ে ওঠে।

নারীর প্রেমই গীতিকবিতার একমাত্র উপাদান নয়। '....কবিমনের তত্ত্বচিন্তা-ভাবনাও গীতিকবিতার রূপ গ্রহণ করতে পারে। বাইরের বিষয়বস্তু, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে গুরুতর তত্ত্ব, ইতিহাসের তথ্য সবই গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্ত। জোর করে বসিয়ে দেওয়া নয়, অন্তরে এর প্রতিষ্ঠা চাই।' [৫]

পাশ্চাত্য গীতিকবি Wordsworth কবিতায় যে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, তাতে গীতিরস কোথাও ক্ষুণ্ন হয়নি। বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী একটি শক্তি বিরাজমান,

> **A motion and a spirit, that impels**
> **All thinking things, all objects of all thought,**
> **And roll through all things. (Sintern Abbey)[৬]**

কবিগুরুর বিশিষ্ট কতকগুলো গীতিকবিতায় তত্ত্বের সমাবেশ আছে; কিন্তু গীতিরস সেখানে অক্ষুণ্ন। মধ্যযুগে এইসব তত্ত্বকে আশ্রয় করে যে সব গীতিকবিতার প্রকাশ ঘটেছে বাউল পদ বা গীতি তাদের অন্যতম। গোষ্ঠীচেতনা হতে বাউল পদাবলী অনেকখানি মুক্ত। মুক্ত এই কারণে যে তাকে সমাজধর্মের তেমন কোন অনুশাসন মানতে হয়নি। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের সাথে তার পরিচয় কম। বাউল কবিরা যাকে অনুসন্ধান করেছেন রূপ তার যেমনই হোক, আসল কথা সে 'মনের মানুষ।' কবি রবীন্দ্রনাথ তাই এ-গানের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। সাহিত্য, দর্শন ও সঙ্গীত এর সাথে জড়িত।

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সে মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।
লাগি সেই হৃদয় শশী
সদা প্রাণ হয় উদাসী
পেলে মন হত খুশী
দেখতাম নয়ন ভরে।

চির আকাঙ্ক্ষিতের যখন সন্ধান মিলে না তখন বাউল কবি তার কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন করে—

আরে মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আমি জনম ভইর‍্যা বাইলাম তরীরে
তরী ভাইটায় বই আর উজায় না।

আধুনিক গীতিকবিতার কবিমনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ বাউল কবিতায়। আমি, তুমি সম্পর্কের মধ্যে তা অনেকখানি স্পষ্ট। পাণ্ডিত্যবর্জিত ব্যবহারিক ভাষায় কেবলমাত্র মনের কথাই এর প্রাণকেন্দ্র।

মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতায় বৈষ্ণব-বাউল পদাবলীকে সার্থকতার আসন দান করা হয়; কিন্তু গীতিপ্রবণতা যে বাঙালীর স্বভাবজাত এ-যুগীয় অন্যান্য রচনায়ও তা বিধৃত। *চর্যাপদ* থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই গীতিপ্রবণতা কি মহাকাব্যে, কি লৌকিক কাব্য, কি গাথাকাব্য—সমস্ত কাব্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত।

চর্যাপদ-এর পর প্রাচীন কাব্যসৃষ্টি নাথসাহিত্যে প্রেম ও বিরহমূলক কবিতায় না-পাওয়ার বেদনা মূর্ত হয়েছে। নিছক কাহিনীসৃষ্টির মধ্যেও এর কাব্য-রস দানা বেঁধে উঠেছে। *গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে* স্বামীর বিরহে কাতরা পত্নী বলছে—

তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তরু লতা।
রাঙাচরণ বেড়িয়ে লমু পালায় যাবু কোথা। ৭

বাঙালী কবি যাই রচনা করুক না কেন আপন স্বভাবের রং রস তাতে মিশ্রিত। বাল্মীকি-রামায়ণের সাথে কৃত্তিবাসী-রামায়ণের মৌলিক প্রভেদ কৃত্তিবাসের বাঙালীত্বে। *রামায়ণে*'র যে দিকটা পাঠক মনকে অধিক আকৃষ্ট করে তা রাম-সীতার প্রেমের নিদর্শন। স্পর্শকাতর বাঙালী মনে তাই *রামায়ণ*-এর প্রভাব এত বেশী। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে যে সকল কবি কাব্যসৃষ্টিতে হস্তক্ষেপ করেছেন, বক্তব্য বিষয়ে নিজেদের কোন কৃতিত্ব বা দায়িত্ব নেই বলে তাঁরা মনে করেন—কাহিনীগুলো যেন তাঁরা ভাববিভোর অবস্থায় বর্ণনা করেছেন। *রামায়ণ*-এর দু'একটি জায়গা আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, অলক্ষ্যে কোন কবির ভাব-বিহ্বল মন আপন হৃদয়ের রস সংযোজন করে ফেলেছে। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে সীতার হৃদয় অধীর হয়ে উঠেছেঃ

সর্বলোকে বলে মোরে অবিষ্ঠা সীতা।
আমারে বিধবা কৈল্য কেমন বিধাতা।।
অকারণে আছরে রাবণ মোর কাছে।
গলায় কাটারি দিয়া যাব প্রভুর পাশে।। ৮

সেই স্বামী যখন সীতাকে গ্রহণ করবার সময় বারে বারে তার সতীত্ব পরীক্ষা করতে চেয়েছে তখন জানকী আর ধৈর্য ধরতে পারেনি। দুঃখের গভীরতায় সে মর্মাহত হয়েছে এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজেছে চিরবিদায় গ্রহণে—

আজি হতে ঘুচুক তোমার লাজ দুখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ।।

সামগ্রিকভাবে *রামায়ণ*-এর যে কাহিনী তাই আমাদের মনে একটি বেদনারস পরিবেশন করে। মূল ট্র্যাজিডি বলতে যা বুঝায় *রামায়ণ* সেই শ্রেণীর কাব্য। সমস্ত শক্তি দিয়ে সীতাকে উদ্ধার করেও তার ভালে মিলনের জয় টীকা পরান গেল না। এ 'শেষ হয়েও হইল না শেষ'-ই কাব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। শুধু সীতার দুঃখ নয়, ইন্দ্রজিতের জন্য মন্দোদরী এবং লক্ষ্মণের জন্য রামের যে হৃদয়াবেগ প্রকাশিত হয়েছে তাতেও যথেষ্ট গীতিসুর লক্ষণীয়। দেব-দেবীরূপ যে রাম-সীতা তাদের হৃদয়োচ্ছ্বাসই কেবল পাঠক মনে রেখাপাত করে না, সৃষ্টির কৌশলে এ যুগের শিল্পীও রাক্ষসকুলের অন্তরের বেদনাকে সুন্দররূপে ফুটাতে সক্ষম হয়েছেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মন্দোদরীর যে করুণ আর্তনাদ, তা শ্রবণে হৃদয় মথিত হয় না— এমন মানব-মানবীর সংখ্যা বিরল।

আমি নানা উপহারে পূজিয়া যে মহেশ্বরে
তোমা পুত্র পাইলাম কোলে।
কিছুদিন ছিল সুখ এখন ঘটিল দুখ।
হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে।। [৯]

আবার মহাকাব্য *মহাভারত* যুদ্ধ-বিগ্রহপূর্ণ গ্রন্থ হলেও ছোট ছোট উপাখ্যানে প্রেম-প্রীতির রসাবেশ নিতান্ত অল্প নয়। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, নল-দময়ন্তীর কাহিনী এখনো দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জীবনে করুণ রসের বা বিচ্ছেদের দহন জ্বালা না সইলে মিলনের পূর্ণসুখ উপলব্ধি করা যায় না। তাই সর্বত্র একটা না-পাওয়ার বেদনা অনুরণিত হয়েছে। নলকে না পেয়ে দময়ন্তী বলেছে:

দুখ সিন্ধু মধ্যে প্রভু কেন দেহ দুখ।
অতি শীঘ্র এস নাথ দেখি তব মুখ।। [১০]

পুত্র শোকে মন্দোদরীর ন্যায় গান্ধারীর হৃদয়ের যে আকুল অভিব্যক্তি গীতিসুরের বীজ সেখানেও অঙ্কুরিত। যে কৃষ্ণলীলা *বৈষ্ণব পদাবলীর* প্রাণস্বরূপ বাংলায় তার প্রথম রূপায়ণ ঘটে *শ্রী-মদ্ভাগবত*-এর অনুবাদ *শ্রীকৃষ্ণ বিজয়*-এ এখানে কৃষ্ণের সৌন্দর্যবান সত্তার প্রতিফলন অধিক।

আখ্যানমূলক লৌকিক কাব্যগুলো এ—যুগের মৌলিক সৃষ্টি। প্রত্যক্ষভাবে এতে যতই দেবমাহাত্ম্যের কথা বলা হোক না কেন—সংখ্যাগুরু নিম্নশ্রেণীর হৃদয়বেদনা এতে পুঞ্জীভূত। পৌরাণিক কাব্যের জীবন অপেক্ষা এই জীবন আমাদের নিকট-আত্মীয়। এতে পৌরাণিক কাব্যের কারুণ্য মিশ্রিত ভাব-রস প্রধান হয়ে উঠলেও জীবনের মূল্যবোধের যে রূপ, তা তেমন স্পষ্ট নয়। স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা আধুনিকতার বিশেষ উপাদান রূপে গণ্য। কিন্তু মধ্যযুগে ঘরছাড়া কবিগণই ওর বীজ বপন করেছেন। লৌকিক মঙ্গলকাব্যের লোকগাথা ও বিলাপগুলো কবিমনের মর্মবেদনায় পরিপূর্ণ। *রামায়ণ, মহাভারত* প্রভৃতি অনুবাদ কাব্যে বিচিত্র রস পরিবেশিত হয়েছে; কিন্তু *মঙ্গলকাব্যে*-কাহিনীর অন্তরালে করুণ রসের ফল্গুধারা অবিরামভাবে বয়ে চলেছে। অন্তরমুখী সুগভীর অনুভূতি ছাড়া সে রস উপলব্ধি করা যায় না।

নববিবাহিত দম্পতি লক্ষিন্দর বেহুলার জীবনে দেবতার অভিশাপে যে অকাল অমানিশা নেমে আসে, বেহুলার বিলাপে তা হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে—

তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া
কাল নিদ্রা পাইলু শেষে।
মোর প্রাণধণ লইল কোনজন
না জানি পাইব কোন দেশে। [১১]

(কেতকদাস ক্ষেমানন্দ, পৃ. ২০৩)

লক্ষিন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার ব্যাকুলতা শুধু অশ্রুঝরা বিলাপেই সীমাবদ্ধ নয়, স্বামীকে পুনর্জীবন দান করবার তার যে প্রাণান্ত প্রয়াস, পাঠক মনকে তা সহজেই অভিভূত করে।

আশ্বিন মাসেতে মাও গো, নেতীর ঘাটে আইলু,
রজকীর রূপ ধরি কাপড় ধুইলু।
বড়ের কুমারী হইয়া না বাসিলু ভিন,
নেতার ঘাটেতে ছিল সমস্ত আশ্বিন।
কার্তিক মাসেতে মাগো, ত্রিদশের মেলে আইলু
নর্তকীর বেশ ধরি দেবতা মানাইলু।

(যষ্টিবর সেন, পৃ. ২৩)

সম্পদশালী সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ হয়েও সে এত হেয় কাজ করতে পরান্মুখ হয় না। এ সম্ভব হয়েছে প্রেমের একনিষ্ঠতায়।

গোষ্ঠীপ্রধান মধ্যযুগে 'চাঁদবেনের' ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র সমগ্র কাব্য-ধারায় একটা ব্যতিক্রম সৃষ্টি। সমুদ্রযাত্রাকালে ধনপতি তো নিঃসংশয়ে চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত

করেছে। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ফুল্লরা-কর্তৃক দেবীর নিকট দারিদ্র্যবর্ণনায় কবির আপন হৃদয়ের ব্যথা-বেদনাই ব্যক্ত হয়েছে। কমলার নিকট যে গৌরী খেদোক্তি করেছে সে মধ্যযুগেরই নায়িকা, তাই দেবীর মুখে কবি এমন বাস্তব কারুণ্যের কথা ফুটাতে পেরেছেন:

কি কহিব সহচরি মনের বিবল কথা।
মিথ্যা নারী করি মোরে সৃজিল বিধাতা।।
দোষ বিনে প্রভু মোরে বলে কটু ওর।
একা বসি থাক শিব ছাড়ি যাব ঘর।।[১২]

নীলাম্বরের মৃত্যুতে ছায়ার যে মনোভাব তাও কম হৃদয়গ্রাহী নয়। *মঙ্গলকাব্য'*র বিষয় যাই হোক তা যে গীতোদ্দেশ্যে রচিত তার প্রমাণ পাওয়া যায় কাব্যের দৃশ্য বিচারে। কতকগুলো গ্রন্থে কাহিনী খণ্ডাকারে বিবৃত এবং প্রতি পদের শীর্ষদেশে, রাগ-মল্লার, রাগ গুঞ্জুরী, রাগ সিন্ধুতা, রাগ মালশী প্রভৃতি সুরের সঙ্কেত বহন করে।

এ-যুগের কাব্য হৃদয়ের বেদনা — তা যে স্থানের প্রতি মমতারই হোক, কিম্বা প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকারই হোক 'বিলাপ' নামেই অধিক পরিচিত। *মঙ্গলকাব্যগন্ধী সত্যনারায়ন* বা *সত্যপীরের ব্রতকথা*গুলোতেও এই দিকটার পরিচয় মেলে। সত্যানন্দ বণিকের কন্যা — চন্দ্রকলা, সত্যপীরের এঁটো সিন্নি না গ্রহণ করায়, তার স্বামী জলমগ্ন হয়। তাতে কন্যা,

হাহাকার করি মুখে চাপড় মারয়ে বুকে
সুকপালে কঙ্কারের ঘাত
ধৈরজ ধরিতে নারে কেন্দে কহে কলস্বরে
কোথা কারে গেলে প্রাণনাথ।[১৩]

একবার দরশন দেও
না দেখিয়া তুয়া মুখ বিদরিয়া যায় বুক
অভাগীরে সঙ্গে করি নেও।

প্রিয়বিচ্ছেদে সত্যাবতীও অধীর হয়ে উঠেছে,

বিলাপএ সত্যাবতী শোকাকুল দুঃখমতি
ঘনঘন করে অঙ্গঘাত,
কুবরী কুহরে যেন উচ্চস্বরে কাঁদে তেন
সম্বোধিয়া নিজ প্রাণ নাথ।।
....
সখিকে সম্বোধি বলে নয়ন ভরিয়া জলে

শুন সব মোর নিবেদন।
ফুটিল দারুন শেল হৃদয় ভেদিয়া গেল
প্রভু মোর তেজিল জীবন। [১৪]

এই গীতিসুরের আভাস কেবল পৌরাণিক ও মঙ্গলকাব্যধারার মধ্যে সীমায়িত নয়, ধর্মনিরপেক্ষ-কাব্য রোমান্টিকতার স্পর্শে এর যুক্তি তরান্বিত হয়। এই পৃথিবী যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি বিচিত্র মানুষের মন। ধর্মপ্রধান, পরে অপেক্ষাকৃত শিথিলধর্মী লোকসাহিত্যের পাশে ধীরে ধীরে মানুষের স্বাভাবিক মনোধর্মের বিকাশ ঘটতে থাকে। ঐতিহাসিকেরা এর পথিকৃৎ হিসেবে মুসলমান কবি-সাহিত্যিক-গণকেই স্বীকৃতি দান করেছেন। ১৪ শতকের *ইউসুফ জোলেখা* কাব্য থেকে *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* পর্যন্ত এই সুরের ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। প্রেমনিবেদন, বারমাসী বর্ণনা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে কবিমনের কোমল বৃত্তি প্রকাশিত। অপূর্ব গীতিরসে অপরের মনকেও দ্রবিভূত করে। কালের গণ্ডী অতিক্রম করে এ-কাব্য যে আধুনিক পাঠক মনেও রেখাপাত করতে পেরেছে সার্বজনীন গুণে, সেখানেই এর পরম সার্থকতা। কাব্যের ভাব বা আদর্শ যেখান হতেই গৃহীত হোক না কেন, ভাষান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা কবিমনের কল্পনা ও অনুভূতিরসে সিক্ত হয়ে নতুন সৃষ্টির গৌরবাধিকারী।

ইউসুফের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে জুলেখা যখন আত্মসমর্পন করতে উন্মুখ, ইউসুফ তা অকুণ্ঠিত চিত্তে সমর্থন করেনি। প্রেমের ধারাই যেন তাই। অন্তরের আকুতি যত তীব্রতর, বাইরের ধারা তত প্রবল আকার ধারণ করেছে। জুলেখাকে যথেষ্ট উপদেশ দানের পরও সে অতি করুণভাবে আপন মনোবেদনা প্রকাশ করেছে :

যবে তোর মর্মান্তরে নাহিক স্মরণ।
তোমার মনের ভাবে আমার মরণ।।
প্রেমাণলে জ্বলিত মনের আশ।
তা হোন্তে অধিক গুণ নাহিক প্রকাশ।

(জুলেখার প্রেমনিবেদন)[১৫]

লায়লী-মজনু কাব্যে আদ্যন্ত একটি করুণ রস মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়েই পরস্পরকে একান্তে কামনা করে; কিন্তু সমাজ-সংস্কারের কঠোর দৃষ্টি তাদের মিলন পথের অন্তরায়। মজনু তবু পাগল হয়ে প্রেম-জ্বালাকে যেমন-খুশী প্রকাশ করতে পেরেছে; কিন্তু বুকফাটা বিরহ নিয়ে লাইলীর মুখ বন্ধ—

নিশি দিশি হৃদয় তাপিত হত বুদ্ধি।
হারাইয়া জ্ঞান মান নাহি কিছু সুদ্ধি।।

এক তিলে শতবার হারাই জীবন।
জন্ম হৈল ব্যর্থ বিফল যৌবন।।
এরূপে জনম গোঞা এ বিরহিনী।
কহিতে নাহিক অন্ত সেসব কাহিনী।।
দৌলত উজির কহে নিজ অনুমানে।
যাহার মরম দুঃখ সেই ভালজানে।।[১৬]

মিলনাত্মক কাব্য *মধুমালতী*; কিন্তু সেখানেও নায়ক-নায়িকাকে মিলনের পূর্বে বিচ্ছেদের রসাস্বাদন করতে হয়েছে। এদিকে মালতী বিরহ জ্বালায় তাপিত,

মন পুড়ে হিয়া ঝুরে খোয়া এরে জান।
এইরূপে গেল প্রাণ কি হইল জঞ্জাল।। [১৩]

অপরদিকে মনোহর, অনুরূপ বেদনার ভার লাঘবার্থে মালতীকে সংবাদ পাঠিয়েছে,

পরান পিরীতি মোর কভু না ছাড়িবা
মুঞি হেন প্রেম দাস মনেত রাখিবা।।

সতীময়না লোর চন্দ্রানী কাব্যেও এই সুরের ঝঙ্কার শোনা যায়। ময়নাকে পরিত্যাগ করে স্বামী লোর যখন চন্দ্রানীকে করায়ত্ত করতে ব্যস্ত, তখন মালিনীর প্রতি ময়নার উক্তিগুলি সত্যই অত্যন্ত বেদনাঘন এবং তা অকৃত্রিম প্রেমেরই পরিচায়কঃ

যে বল কোমল মলয় পবন
লোর বিনু সেই হয় মন্দ।
কোথায় বসন্ত আসে উদ্‌ভ্রান্ত
গরল উদগোরে চান্দ।। [১৮]

ময়নার খেদে *বৈষ্ণব কবিতা*র বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান, এখানেও গীতিসুরেরই প্রাধান্য,

মালিনী কি মোর ফাল্গুর বিলাসা।
নিদাঘ শরৎবর সম্পদ জানে মোর
অন্তরে তাপ তরাসা।।
ফাল্গুনে কোন্ গুণ রঙ্গিমা ফাল্গুন
কুসুম সৌরভ সিন্দুর।
খেলি, কিলি, মেলি; সকল গেল সেরি
যদি গেল কান্ত সেদূর।।

(সতী ময়নামতী ও লোরচন্দ্রানী)

রোমান্টিক কাহিনীকাব্য, *পদ্মাবতী*তে গীতিসুর ফল্গুধারার ন্যায়। কাব্যের নায়ক-নায়িকা কারো মনে শান্তি নেইঃ

প্রিয়তমা লাগি যদি তেজাবি জীবন
জন্মান্তরে পাব আমি সে চন্দ্র বদন।। [১৯]

পদ্মাবতীর মনেও অনুরূপ ধারণা,

যেন মতে পার এথা আনহ নৃপতি।
জীবনে মরণে আমি তাহার সঙ্গতি।।
(*পদ্মাবতী*–১৭০)

পুঁথিসাহিত্যে বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা পরিবেশিত হয়েছে; কিন্তু কারবালা প্রান্তরে হোসেন পরিবারের করুণ পরিণতি সমগ্র কাব্যিক পরিবেশকে ব্যথাতুর করে তুলেছে। সমগ্র দুঃখের কাহিনীর মধ্যে কাসেমের অকাল মৃত্যুতে সখিনার বিলাপ পাঠকের মনকে অধিক সংবেদনশীল করেছেঃ

কান্দে কাসেমের নারী   বিভা হৈল দিন চারি
তাথে বিধি হৈল শোকে রাড়ী।
আউলাইন মায়ার কেশ   দূর কৈল নাম বেশ
কান্দে রামা ভূমে দিয়া গড়ি।।
(*জঙ্গনামা*)

কাহিনীকাব্য ছাড়াও গাথাকাব্যের মধ্যে রোমান্টিক গীতিভাব বিরাজিত। *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*গুলো এর জীবন্ত উদাহরণ। কোন প্রকার তত্ত্ব বা ধর্মাবরণের স্পর্শ এখানে নেই, তা কেবল হৃদয়ধর্মের স্বীকৃতিতে উজ্জ্বল। স্বামী দুলাল কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে মদিনার যে বারমাসী বিলাপ তা সত্যই হৃদয় বিদারক :

মদিনা কান্দেরে, আল্লা? কি লেখেছ কপালে।
বনের পংখী অইয়া যেমন উইড়া গেলে চইলে।।
পরানের পংখী আমার পরান লইয়া গেলা।
পাষাণে বান্ধিয়া দিল রাখিলা একেলা।।[২০]

শুধু মদিনা নয়, প্রায় প্রতিটি গীতিকার নায়িকাকেই এই বিভিন্ন দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রেমিক প্রত্যাখ্যান করায় চন্দ্রাবতীকে কঠোর আত্মসাধনা করতে হয়েছে। চরম দুঃখে মলুয়া আত্মহত্যা করেছে, তথাপি পিতৃআজ্ঞায় প্রিয়তমকে বধ করতে পারেনি; স্বামীর মৃত্যুতে মলুয়া দিশেহারা — আর দাসীর প্রবঞ্চনায় কাজলরেখার জীবন বিষময় হয়েছে। এদের পুঞ্জীভূত বেদনা মর্তলোকের একান্ত আপনার জিনিস। কোন প্রকার তত্ত্বকথা এর সজীবতাকে নষ্ট করতে পারেনি বলেই তা পাঠক মনকে সহজে আকৃষ্ট করে।

তথ্যনির্দেশ

১. W. H. Hudson, *An Introduction to the study of the literature*, London, 1949.

২. শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *চিত্রে জয়দেব*, কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ২৬৫

৩. ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, কলিকাতা, পৃ. ১০

৪. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী ও শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী, *বৈষ্ণব পদাবলী*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫,

৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*, কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃ.২৬৭

৬. Memillan & Co. *Golden Treasury*, London, 1948.

৭. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃ. ৪৮

৮. কৃত্তিবাস, *রামায়ণ*, কলিকাতা, ১৩৬৪ পৃ. ২৪৮

৯. কৃত্তিবাস, *রামায়ণ*, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ৩৪৭

১০. কাশীরাম, *মহাভারত*, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃ. ৪১৭

১১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাইশ কবির মনসামঙ্গল*, কলিকাতা।

১২. মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডী*, কলিকাতা, ১৯৫১, পৃ. ১১৯

১৩. পরমেশ্বর ভট্টাচার্য, *সত্যনারায়ণের ব্রতকথা*, কলিকাতা, পৃ. ৪২

১৪. মুহম্মদ খান, *সত্যকলি বিবাদসংবাদ*, কলিকাতা, পৃ. ১৬০

১৫. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ, শাহ্ মুহম্মদ সগীর, *ইউসুফ জুলেখা*, ঢাকা, ১৩৬৯

১৬. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ, দৌলত উজির বাহরাম খান, *লাইলী মজনু*, ঢাকা, ১৩৬৯

১৭. মুহম্মদ কবির, *মধুমালতী*, ঢাকা, ১৩৬৬ পৃ. ১৪

১৮. *দৌলত কাজী*, *সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী*, শান্তিনিকেতন, পৃ. ১৪০

১৯. আলাওল, *পদ্মাবতী* (১ম খণ্ড), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪০, পৃ. ১৫০

২০. ডক্টর মাযহারুল ইসলাম, *কবি হেয়াত মামুদ*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১, পৃ. ৪৬